পরদিন দুপুরের দিকে অবিনেশের ফোন এলো। রহমত হোটেলের কাছেই একটা রেস্টুরেন্টে বসে লাঞ্চ সারছিল। আগের দিন সারাটা দিন অবিনেশের ওঝার জন্য অপেক্ষা করেছে, কোন লাভ হয় নি। বদমাস ব্যাটা যোগাযোগ করে নি। ইন্টারনেটে গিয়ে কিছু খোঁজ করেছে। লাভ হয় নি। শহরের মানুষ জনকে জিজ্ঞেস করেছে। কেউ কিছু বলতে পারে নি।

অবিনেশ ফোনেই চেঁচিয়ে বলল, "রহমত ভাই, খবর তো পাওয়া গেছে। যলদি হোটেলে ফিরে আসেন। আলাপ আছে।"

বোঝা গেল ভালো খবর আছে। খাওয়া দাওয়া ফেলে ছুটল। হোটেলে ঢুকতেই অবিনেশের সাথে দেখা। সে তার অপেক্ষাতেই ছিল। গলা নামিয়ে বলল, "ব্যাটার সাথে কথা হয়েছে। মোল্লাকে চেনে। বলল সে নাকি ওঝাদের বাপ। আপনার কামরায় যান, আমি আসছি।"

রহমতের প্রায় পিছু পিছু এলো অবিনেশ। বোঝা গেল খবরটা না দেয়া পর্যন্ত তার শান্তি হচ্ছে না। কামরায় ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিয়ে এক গাল হাসি নিয়ে বলল, "আপনার ভাই কপালটা ভালো, আমার হোটেলে এসে উঠেছিলেন। আমি না থাকলে মোল্লার হদিস পেতেন?"

রহমত অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে কিন্তু মুখে সেটা প্রকাশ করল না। "যাদবপুরটা কোথায় জানা গেছে?"

ফিক করে হাসল অবিনেশ। "কিসের যাদবপুর? কোন যাদবপুর-টুরে আপনার যেতে হবে না। আমার ওঝা মোল্লাকে খুব ভালো মত চেনে। খুব সম্মান করে। তার বাড়ী এখান থেকে অনেক দূরে, অন্য জেলায়। জুলেখার বাবা মতি আলী যখন একজন ভালো ওঝার খোঁজ করছিলেন, এই লোকই মোল্লাকে খবর দেয়। বুঝলেন ব্যাপারটা?"

অবিনেশ দাঁত বের করে হাসছে, কৃতিত্বের হাসি। রহমতকে মনে মনে স্বীকার করতে হল, ভদ্রলোক একটা কাজের কাজ করেছে। এখন মোল্লাকে কোথায় পাওয়া যাবে জানলেই সে তার হিসাব কিতাব চুকিয়ে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়বে, এখানে হাবার মত বসে থাকতে তার ভালো লাগছে না। এই মোল্লা ব্যাটাকে পেলেই তো হল না, তাকে কিভাবে কানাডা নেয়া যাবে সেটাও একটা ভাবনার বিষয়।

রহমত তাড়া দিল, "কি জানলেন বলুন দাদা। কি খবর পেলেন? মোল্লা ইমামকে কোথায় পাওয়া যাবে?"

অবিনেশ নাটকীয় ভঙ্গীতে বলল, "ভগবানের কি কৃপা! আপনার মোল্লা ইমাম গত বছর আমেরিকা চলে গেছে এক মসজিদের ইমাম হয়ে। তার এলাকার কিছু মানুষ এক শহরে নতুন মসজিদ বানিয়েছিল। তার এদিকে এতো নাম ডাক। তাকে ইমামের কাজ দিয়ে নিয়ে গেছে। এবার বলুন, এটা ভালো হল না খারাপ হল?"

রহমত হাসল। "খবর তো খুবই ভালো। কিন্তু আমেরিকায় কোথায় থাকে? সেসব কিছু বলতে পারল?"

"টেক্সাসে। ডালাসে। ঠিকানা টা বলতে পারে নি কিন্তু ওখানে আর কয়টাইবা মসজিদ আছে? এ তো মুসলিম দেশ না যে মোড়ে মোড়ে মসজিদ থাকবে। ঠিক বলেছি কিনা?"

তার কথা মানতেই হল। ওখানকার ইসলামিক কোন সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করলে তারা হয়ত মোল্লার খোঁজ দিতে পারবে। ইন্টারনেটে গিয়ে সামান্য খুঁজতেই একটা সংগঠনের ফোন নাম্বার পাওয়া গেল। কিন্তু টেক্সাসে এখন রাত। মনে হয় না কাউকে পাওয়া যাবে। তবুও কল করল। কেউ ধরল না। ভয়েস মেইলে চলে গেল। একটা মেসেজ রাখল রহমত।

তার ফোন নাম্বারটা রেখে দিল। 'মোল্লা ইমামকে খুবই প্রয়োজন। যদি তার খবর জানা থাকে তাহলে রহমতকে যেন একটা খবর দেয়া হয়। জীবন মরনের ব্যাপার'।

অবিনেশের হোটেলের বিল সব শোধ করে, দিদারকে মোটা অংকের বখশিশ দিয়ে গাড়ী নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল রহমত। এখানকার কাজ তার শেষ হয়েছে। এখন তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সে টরন্টো ফিরবে নাকি ডালাস যাবে মোল্লাকে খুঁজে বের করতে। মোল্লার সাথে যোগাযোগ করতে না পারা পর্যন্ত ক্ষান্তি দিলে চলবে না।

ঢাকা পৌঁছাতে রাত হল। একটা ভালো হোটেলে গিয়ে রুম নিল। অবিনাশের হোটেল রাজা রানীর তুলনায় স্বর্গ। তবে হোটেল যেমনই হোক, অবিনাশ মানুষটা চমৎকার। আবার কখন গেলে সে নির্ঘাত তার হোটেলেই গিয়ে আস্তানা গাড়বে।

মাত্র হাত মুখ ধুয়ে রুম সার্ভিস অর্ডার দেবে, এমন সময় তার মোবাইলটা বেজে উঠল। অচেনা নাম্বার। স্থানীয় নয়। ধরল। "হ্যালো!"

"আপনি রহমত সাহেব বলছেন?" একটা গুরু গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

"জ্বী। আপনি?" রহমত আশা করছে টেক্সাসের ইসলামিক কেন্দ্র থেকে কেউ হবে।

"আমি মোল্লা ইমাম বলছি। আপনি সেন্টারে একটা মেসেজ রেখেছিলেন। আমাকে কেন খুঁজছেন বলুন তো?"

রহমতের সারা মুখ নিঃশব্দ হাসিতে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। তার কপাল দেখা যাচ্ছে ক'দিন ধরে খুব ভালো যাচ্ছে। সে দ্রুত বলল, "মোল্লা সাহেব, আপনাকে আমাদের ভীষণ দরকার। বেশ কিছুদিন আগে আপনি একটি মেয়ের চিকিৎসা করেছিলেন..."

"জুলেখা। জুলেখার কথা বলছেন?"

"আপনার মনে আছে তাহলে?"

এক মুহূর্তের নীরবতা। "আমি জেনেছি ও বিয়ে করে টরন্টো এসেছে। চাঁদনী নিশ্চয় এখনও ওর সাথেই আছে। অসম্ভব পাজী জ্বীন। আমি জীবনে খুব কম হার মেনেছি। কিন্তু তার মধ্যে চাঁদনী একজন।"

রহমতের বুক ভাঙার জোগাড় হল। মোল্লা নাকি ওঝাদের বাপ। সে যদি হার মেনে থাকে তাহলে আর কার কাছে যাওয়া যাবে। "আপনি চাঁদনীকে তাড়াতে পারেননি?"

"পারলে তো আপনারা কোন সমস্যায় পড়তেন না," অন্য দিক থেকে শান্ত কণ্ঠের উত্তর এল। "জুলেখার জীবনটাও এমন ভাবে ছিন্ন ভিন্ন হত না।"

রহমত কণ্ঠস্বরে খানিকটা আকুতি মিশিয়ে বলল, "আপনার সাহায্যের আমাদের খুবই দরকার। জুলেখা আমার বন্ধুর স্ত্রী। তাকে নিয়ে আমরা খুব ভয়ে ভয়ে আছি। আমি গ্রামে পর্যন্ত গিয়েছিলাম। সেখান থেকেই আপনার খবর পেলাম।"

"নিশ্চয় দাই মার কাছ থেকে জেনেছেন। মতি মিয়া – জুলেখার বাবা, খুব গোপনীয়তা চেয়েছিলেন। জুলেখা কোথায়?"

"এজাক্সে - টরন্টোর কাছাকাছি একটা শহর। আপনি কি কিছুই করতে পারবেন না?"

একটু নীরবতা। "হয়ত পারব। গতবার যখন চেষ্টা করেছিলাম, আমার ব্যার্থ হবার পেছনে জুলেখারও একটা বড় ভুমিকা ছিল। চাঁদনীর সাথে সে খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। নিজেই তাকে যেতে দিতে চায় নি। সেক্ষেত্রে জ্বীন তাড়ানো খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে জ্বীন যদি দুষ্ট হয় । কিন্তু আমি আরেকবার চেষ্টা করতে চাই। তাছাড়া..."

মোল্লাকে হঠাৎ থেমে যেতে দেখে রহমত বলল, "তাছাড়া?"
"আমার হাতে একটা তুরুপের তাস আছে এখন। আমাকে আপনার বন্ধুর ঠিকানা দিন। সামনে পুর্ণীমা আছে। সেই সময়ে একটা চেষ্টা করা যায়।"
রহমত অবাক হয়ে বলল, "পুর্ণীমা থাকলে কি সুবিধা?"
"চাঁদনী খুব রোমান্টিক। পুর্নীমার রাতে সে মানসিকভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে। আমার ধারণা তাকে তাড়ানোর সেটাই সবচেয়ে ভালো সময়। তার শক্তি এবং ক্ষমতা হয়ত একশ' ভাগ থকবে না।" মোল্লা বলল।
রহমত একটু দ্বিধা করে বলল, "শুনলাম চাঁদনীর প্রেমিককে আপনি বশ করেছিলেন। সেটা কি সত্য?"
"আটকে রেখেছি," মোল্লা বলল। "তার নাম জমিন। আমার তুরুপের তাস। গ্রামে গিয়ে আর কি শুনেছেন?"
রহমত একটু ভাবল। বাশারের প্রসঙ্গ তোলাটা কি ঠিক হবে? তার মৃত্যুর জন্য মোল্লা কত টুকু দায়ী ছিল বলা শক্ত। সে-ই ভয়েই কি সে বাংলাদেশ ছেড়েছে? প্রসঙ্গটা আপাতত চেপে যাবারই সিদ্ধান্ত নিল সে। মোল্লা উধাও হয়ে যেতে পারে।
তার দীর্ঘ নীরবতা দেখেই কিছু একটা আন্দাজ করল মোল্লা। "জানি কি ভাবছেন। কিন্তু বাশারের মৃত্যুতে আমার কোন হাত ছিল না। জমিনকে আমি যখন বশ করি, বাশার তখনও সুস্থই ছিল। আমি চলে আসার পর বাবরই তাকে মেরেছে। মতি মিয়ার ভাড়াটে গুন্ডা।"
রহমত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল। নাসেরের কথা মনে হল। বেচারা জানেও না বাবরই ওর ভাইয়ের খুনী। রহমতের কিছুই করার নেই।
"আপনি কি আসবেন?" রহমত জানতে চাইল।
"হ্যাঁ। চাঁদনীর একটা ব্যাবস্থা আমাকে করতেই হবে। তার জন্য জুলেখার জীবনটা নষ্ট হচ্ছে।" মোল্লার কণ্ঠে দৃঢ়তা। মনে হল সে সত্যিই সাহায্য করতে চায়।
রহমত তাকে নিজের এবং মিজানের ঠিকানা দিল। দু' দিন পর টরন্টো পৌঁছাবে সে। মোল্লা তখনই আসবে। রহমতকে দুশ্চিন্তা করতে মানা করল সে। চাঁদনী সমস্যার সমাধান সে এবার করেই ছাড়বে।

রাতে ঘুমাতে পারল না মালেক। মিজান শুতে যাবার পর জুলেখার ঘরে সে এবং জিনিয়া আরও ঘণ্টা খানেক ছিল। কিছুক্ষন কেরাম খেলা চলে, কিছুক্ষন ছবির এলবাম দেখা হয়, নায়লার গানের ভিডিও দেখা হয়। এখানে আসবার আগে কল্পনাতেও ভাবে নি মালেক এমন চমৎকার সময় কাটবে তাদের। বাবার কথা শুনে যা মনে হয়েছিল বাস্তবে তার কোন নিদর্শনই দেখে নি সে। এতো অল্প সময়ের পরিচয়েও তার মনে হচ্ছে সে যেন এই মেয়েটিকে কত দিন ধরে চেনে! নিজের কাছে সত্যটা স্বীকার করতে তার কষ্ট হলেও মনে হচ্ছে এমনই একটা মেয়েকে সে সারা জীবন ধরে খুঁজছিল। শান্ত, ধীর, মায়াময় কিন্তু প্রানোচ্ছল, প্রকৃতি প্রেমিক। জুলেখার সাথে প্রথম দেখাতেই তার কি যেন এক অদ্ভুত যোগাযোগ হয়ে গেছে। কাল রাতে জিনিয়া থাকলেও গল্পের ফাঁকে ফাঁকে সে লক্ষ্য করেছে জুলেখা তাকে আড় চোখে খেয়াল করছে। সে নিজেও জিনিয়ার অগচোরে জুলেখাকে দেখেছে। আকাশী নীল শাড়িতে

এতো সুন্দর লাগছিল! সারা রাত বিছানায় ছটফট করেছে। যতখানি এই অবোধ ভালো লাগাকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছে, ঠিক ততখানিই অপরাধবোধে ভুগেছে। জুলেখা পৃথক কামরায় থাকে, যার অর্থ মিজানের সাথে তার হয়ত শারীরিক সম্পর্ক নেই। কিন্তু জুলেখার প্রতি তার দূর্বলতার কথা মিজান যদি ঘুনাক্ষরেও টের পায় তাহলে সে নিশ্চয় অসম্ভব কষ্ট পাবে।

পাশের ঘরেই জিনিয়া শুয়েছে। একটু পর পরই তার নড়াচড়ার শব্দ পাচ্ছে মালেক। ঘুমের মধ্যে খুব নড়াচড়া করে জিনিয়া, সেই ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছে। প্রায়ই জোরে জোরে কথাও বলে। এটা নিয়ে তাদের মধ্যে অনেক হাসি ঠাট্টা হত। জিনিয়া অবশ্য কখনও স্বীকার করত না। প্রমাণ করবার জন্য মালেক একবার ভিডিও করল। সেটা দেখে জিনিয়া ঠোঁট উলটে বলল, "বানোয়াট ভিডিও"।

জিনিয়ার পরের ঘরটা জুলেখার। সে কি শুয়েছে? মেয়েটাকে আবার দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে সে। মনে মনে অসম্ভব লজ্জিত বোধ করছে। এই বয়েসে এ কি ছেলামানুষী অনুভূতি! এখানে বেশীদিন থাকাটা ঠিক হবে না। সময়ের সাথে সাথে তার দূর্বলতা আরোও বাড়তে পারে। কিন্তু ঝট করে চলে যাওয়াটাও সহজ হবে না। বাবা মন খারাপ করবে। জিনিয়া ক্ষেপে যাবে। সে-ই তাকে নিয়ে এসেছে। সহজে যেতে দেবে না ।

হঠাৎ দরজায় একটা টোকা পড়ল। নিজের অজান্তেই ঘড়ির দিকে তাকাল মালেক। রাত তিনটা। এই সময়ে কে আসবে? বাবা? হয়ত আবার ঘুম ভেঙে গেছে। মালেকের সাথে কথা বলতে চায়।

"কে?" গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল।

কোন উত্তর এলো না কিন্তু এবার দুটা মৃদু টোকা পড়ল। বুকের মধ্যে ধক করে উঠল মালেকের। সে যা ভাবছে তা কি হতে পারে? জিনিয়া নয়। সে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। মিজান নয়। হলে এতক্ষনে নিজের পরিচয় দিত। দ্রুত বিছানা ছাড়ল। দরজাটা সামান্য খুলতেই জুলেখাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। নীল শাড়ীটা এখনও পরে আছে, চুলের খোপা ছেড়ে দিয়েছে। কালো চুলের রাশী পিঠময় ছড়ানো। বুকের মধ্যে হাতুড়ীর বাড়ি পড়ছে মালেকের। জুলেখা এতো রাতে এখানে কেন? মালেকের মনের কথা কি সে পড়ে ফেলেছে?

জুলেখা নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে। করিডোরে নাইট লাইটটা জ্বলছে। সেই আলোতেও তার গভীর কালো চোখের কৃষ্ণতা মনে দোলা দিয়ে যায়। তার শরীরের মিষ্টি একটা গন্ধ মালেকের সব ইন্দ্রিয়কে ছুঁয়ে যায়। সে কোন রকমে ফিসফিসিয়ে বলে, "জুলেখা!"

"ঘুম আসছে না!" জুলেখাও ফিসফিসিয়ে বলে।

"আমারও না।" মালেক লজ্জিত কণ্ঠে বলে।

কয়েক মুহুর্তের নীরবতা। "তোমার বাবার সাথে আমার কোন দৈহিক সম্পর্ক হয় নি," হঠাৎই বলে জুলেখা।

মালেক কি বলবে বুঝতে পারে না। নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

"আমার জীবনটা অভিশাপে ভরা," বিড়বিড়িয়ে বলে জুলেখা। "তোমরা সবাই তার ভাগী হলে। তুমিও। তোমার কিছু হলে আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।"

তার মনের মধ্যে যে আবেগের ঝড় চলছে, জুলেখাও যে তার অংশীদার, জেনে নিজেকে আর ততখানি অপরাধী মনে হয় না মালেকের। তার মনে হয় সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই মেয়েটির

সাথে তার জীবন যেন একই ছন্দে বাঁধা পড়ে গেছে। তার দ্বিধা, দ্বন্দ্ব সব যেন হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গেল। জুলেখার একটা হাত ধরে ঘরের ভেতরে টেনে এনে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল সে। "এসব কি বলছ, জুলেখা? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

তার হাতের ভেতরে জুলেখার হাতখানা আবেগে থর থর করে কাঁপছে। মালেকের চোখে চোখ রাখল সে। "তোমার বাবা তোমাকে সব বলে নি?"

"কি বলেনি?" মালেকের কণ্ঠে স্পষ্ট বিস্ময়।

জুলেখা এক মুহূর্ত দ্বিধা করল। "থাক, তুমি নাই বা জানলে। আমার অভিশাপ আমাকেই বহন করতে হবে।"

মালেক ফিসফিসিয়ে বলল, "দুটি মন যখন কাছাকাছি আসে, নিশ্চয় নিয়তির কোন উদ্দেশ্য থাকে। আমাকে সব খুলে বল।"

জুলেখার সমস্ত শরীর কাঁপছে। "কেন এলে তুমি? মনে হয় যেন আমার সারা জীবন তোমার অপেক্ষাতেই ছিলাম।" মালেকের বুকে মাথা রেখে ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে সে। নিঃশব্দে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় মালেক। কিছু বলে না।

হঠাৎ করেই দরজা খুলে দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে ফিরে যায় জুলেখা। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে মালেক। নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করবার আগে মালেকের দিকে নীরবে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে জুলেখা, আলতো করে হাত নাড়ে। মালেক বিছানায় ফিরে যায়। তার মনের জমাট বাঁধা অপরাধবোধের পাশাপাশি অসম্ভব ভালো লাগার একটা অনুভূতি প্রজাপতির মত পাখা মেলে খামখেয়ালির মত উড়তে থাকল। এই অভিনব অনুভূতিটাকে সে অনেকক্ষণ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করল।